মুক্তকথা

প্রশাসনে ভূত অর্থনীতিতে প্রেতের ছায়া

মাসুদ মজুমদার

প্রশাসনে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ পুরনো। বর্তমান সরকারের আমলে এ মাত্রা অনেক গুণ বেড়েছে। সংসদীয় কমিটির পক্ষ থেকে খোদ প্রধানমন্ত্রীর দরবারে নালিশ করা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে এবং প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে। আমলা প্রশাসনের ব্যাপারে অনুযোগের মাত্রা বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। সবার স্মরণে থাকার কথা, মহাজোট সরকার শপথ নিয়েই প্রশাসনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। রদবদল, ওএসডিকরণ ও ওলটপালট করে দেয়ার লক্ষ্যে ঝড় বইয়ে দিয়েছে। কারো কারো ভাষায় প্রশাসনে প্রলয় ঘটে গেছে। দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই না করেই দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রশাসন সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিনিময়ে মহাজোট সরকার কী সুবিধা পেয়েছে বলা মুশকিল, কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় তারই কুফল এখন অস্বাভাবিক স্থবিরতার জন্ম দিয়েছে। ফলাফল এমনই হবে সেটা বিশেষজ্ঞরা আগাম মন্তব্য করেছিলেন। প্রশাসনে ওলটপালট করা নিয়ে অভিজ্ঞ আমলা ড. আকবর আলি খানের সতর্ক বাণীটি আজো কানে বাজে। বাস্তবে সমস্যা শুধু আমলা প্রশাসনে নয়, এর রাজনৈতিক চরিত্রও বুঝতে হবে। মন্ত্রী ও উপদেষ্টার কাজের পরিধি ঠিক করা নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি সামষ্টিক রেসপনসিবিলিটির কোনো আলামতও নেই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হয়ে উঠেছে সব কাজ ও সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দু। এক দিকে উপদেষ্টারা মন্ত্রীদের তোয়াক্কা করেন না। অন্য দিকে মন্ত্রীরা উপদেষ্টাদের ধার ধারেন না। তার ওপর দলীয় আনুগত্যের একটা ব্যাপার তো আছেই। ফলে আমলা প্রশাসনের সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। অথচ উপদেষ্টা, মন্ত্রী এবং দলীয় প্রভাবশালী মহল সবাই দোষ চাপাচ্ছেন আমলাদের ওপর।

আমাদের আমলাতন্ত্রের ওপর এবার সরকারি অভিযোগ আনলেন সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। তিনি মন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক। এই মন্ত্রী ও নেতা মনে করেন, সিভিল ব্যুরোক্র্যাসির নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বিদ্যমান আইনে এমন ফাঁক রাখা হয়েছে যাতে পদে পদে জনপ্রতিনিধিদের পদদলিত হতে হয়। কারণ আমলারা সামরিক কায়দা-কানুনে অভ্যস্ত, গণতান্ত্রিক কায়দা-কানুনে নয়। তার ভাষায় আমলারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব দেখায়।

অনেকেই অবশ্য হাপিত্যেশ করে বলেন, সরকার ভালো, যা মন্দ আমলা আর ছাত্রলীগের বেপরোয়া ক্যাডাররা। এমন কথা বলে যারা সঙ্কট আড়াল করতে চান তারাই নাসির উদ্দীন হোজ্জার গোশত খাওয়া বিড়াল ওজন করার গল্প শুনিয়ে জনগণকে ঘুম পাড়াতে চান। বাস্তবতা স্বীকার করতে চান না। এভাবে ঘুমপাড়ানি গল্প শুনিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করা হয় না, নির্লজ্জের মতো গণবিরোধী কাজেরও সমর্থন জোগানো হয়। তাতে সরকার পায় একদল চাটুকার। এর ফলে 'আমার আয়ুব খান' বলার মতো গভর্নর পাওয়া যায় কিন্তু জনগণের ক্ষোভ এবং ধসনামা থেকে সরকারকে রক্ষা করা যায় না।

কখনো বলা হচ্ছে, চারদলীয় জোটের সাজানো প্রশাসন মহাজোট সরকারকে অসহযোগিতা করছে। কখনো বা বলা হয়, আমলা প্রশাসনে ষড়যন্ত্র চলছে। অভিযোগ করা হয়, সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমলারা আন্তরিক নন। এর ফলে একধরনের অবিশ্বাস প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সাধারণ রুটিন ওয়ার্কগুলোকেও গতিহীন কিংবা স্থবির করে দিচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় উপদেষ্টার আলাদা কোনো কাজ থাকার কথা নয়। সাধারণভাবে জাতীয় সংসদ আইন ও নীতিগত নির্দেশনা দেয়। সংসদীয় কমিটিগুলো নজরদারি করে। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রণালয় নির্বাহী হিসেবে সব কাজ সম্পন্ন করে। মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে সচিবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আমলাতন্ত্রের মাঠ প্রশাসন উপজেলা পর্যন্ত স্তরবিন্যাস করা আছে। জেলা প্রশাসন মাঠ প্রশাসনের সমন্বয় করে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। আরেকটা বিষয় অনেকেই বিবেচনায় নেন না, অথচ সেটি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমাদের আমলাতন্ত্রের ওপর রাজনীতিবিদদের প্রভাব কম। এর প্রধান কারণ আমলারা অদক্ষতা ও অযোগ্যতার জন্য যে পরিমাণ অভিযুক্ত হতে পারেন, তার চেয়ে রাজনীতিবিদদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কম অভিযুক্ত হওয়ার বিষয় নয়। বর্তমান মন্ত্রিসভায় যারা আছেন তাদের ক'জনইবা সচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিবের চেয়ে বেশি যোগ্য? ঢালাওভাবে আমলাদের গালি দেয়ার আগে রাজনীতিবিদদের, বিশেষত সুরঞ্জিত বাবুর ভাষায় 'কচিকাঁচার' মন্ত্রীদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও যোগ্যতার বহর মেপে দেখাও জরুরি। এসব দিকে নজর না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন দলীয় আদর্শে কাজ করানো সম্ভব হলে সুফল পাওয়া যাবে। তাই ক্ষমতায় আসার আঠারো মাস পর সচিবদের হাতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সচিবদের সাথে তৃতীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলে দিলেন নির্বাচনী মেনিফেস্টো গাইড লাইন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। জানি না এই ধন্বন্তরী কী সুফল দেবে?

রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটানোর বিষয় ও দলবাজি না থাকলে সরকার ও প্রশাসন পরিচালনায় সাধারণভাবে কোনো ফাঁকফোকর থাকার কথা নয়। অনেকের প্রশ্ন উপদেষ্টাদের কাজ কী? তারা কাকে কী কাজের 'উপদেশ' দেন। সেই উপদেশ নীতিগত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ফোরাম কোনটি। কোন প্রক্রিয়ায় কারা আদিষ্ট হয়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন এত সব জিজ্ঞাসার কোনো জবাব মেলে না। সত্যি কথা যত তেতোই হোক, এখন মন্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে চলেন উপদেষ্টা। উপদেষ্টাকে এড়িয়ে চলেন মন্ত্রী। এ দু'জনের ক্ষমতা ও পদবির চাপে পড়েন এবং দ্বন্দ্ব উপভোগ করেন সচিব। অনেক ক্ষেত্রে বনিবনা না হওয়ার বিষয় তো আছেই। মাঝখানে প্রশাসন সচল রাখতে প্রধানমন্ত্রীর দফতর হয়ে উঠেছে মাথাভারী। তাতে রোগ কমেনি; বরং পুরো শরীরের রক্ত মাথায় উঠলে যে রোগের জন্ম নেয়, তাতে রোগী বাঁচে না।

> রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটানোর বিষয় ও দলবাজি না থাকলে সরকার ও প্রশাসন পরিচালনায় সাধারণভাবে কোনো ফাঁকফোকর থাকার কথা নয়। অনেকের প্রশ্ন উপদেষ্টাদের কাজ কী? তারা কাকে কী কাজের 'উপদেশ' দেন। সেই উপদেশ নীতিগত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ফোরাম কোনটি। কোন প্রক্রিয়ায় কারা আদিষ্ট হয়ে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন এত সব জিজ্ঞাসার কোনো জবাব মেলে না। সত্যি কথা যত তেতোই হোক, এখন মন্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে চলেন উপদেষ্টা। উপদেষ্টাকে এড়িয়ে চলেন মন্ত্রী।

আমলা প্রশাসনে মাত্রাহীন স্থবিরতা, গতিহীনতা ও সমন্বয়হীনতার আর কোনো বড় সমস্যা থাকলে সেটি অদলবদলজনিত অযোগ্যতা ও অনভিজ্ঞতার সমস্যা। কাজ বোঝার কিংবা ফাইল সম্পর্কে ধারণা নেয়ার আগেই বদলির অর্ডার এসে যায়। তার ওপর দলীয় আনুগত্যের কারণে অনেক ক্ষেত্রে পিয়ন-চাপরাশিও ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছেন। কর্মচারী সমিতি, কর্মকর্তা ফোরামগুলোর অবস্থা শ্রমিকপল্লীর ট্রেড ইউনিয়নের পর্যায়ে নামানো হয়েছে। তারা শুধু দলীয় চিন্তারই প্রতিফলন ঘটান। তাই দলনিরপেক্ষ আমলারা যেমন সুখে নেই, তেমনি সন্দেহের ঊর্ধ্বেও নন। কারণ নামাজ পড়লেও সন্দেহ করার একটা বাতিক এখন প্রবল। সেই তুলনায় সংখ্যালঘু ও উপজাতি থেকে আসা কর্মকর্তারা এই সরকারের আমলে নিরাপদে ও সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন। ভালো বদলিও পাচ্ছেন। আবার প্রমোশন নিয়েও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এসব সমস্যার বাইরে আমলা প্রশাসন শুধু ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েনি, বাড়তি একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় গুণগত সমস্যা-সঙ্কট বাড়িয়েছে। মহাজোট সরকার গঠনের পর এমন সব পদোন্নতি দিয়েছে, এমন কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ওএসডি কিংবা বদলি করেছে, তাতে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক দফতর অধিদফতর ও বিভাগে অভিজ্ঞতার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আবার বিতর্কিত পদোন্নতি ছাড়াও অবসর থেকে কর্মে ফিরিয়ে এনে পদোন্নতির খেসারতও কম দিতে হচ্ছে না। এ ছাড়া দলীয়করণের আরেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত তদবির বাণিজ্যের রমরমা অবস্থার দায়ও আমলাদের নিতে হয়। অথচ তদবির বাণিজ্য চলে রাজনীতির প্রশ্রয়ে, দলীয় ছত্রছায়ায়। অধিকন্তু মহাজোট সরকারে জনাকয়েক মন্ত্রী আছেন যাদের অতীত রাজনৈতিক পরিচয় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রিক নয়, তারা বর্ণ পাল্টানোর কারণে অতীতের পিছু টানের দোষে আক্রান্ত না হলেও আগের দলপ্রীতির জন্য অভিযুক্ত। আওয়ামী লীগের মতো এত বড় দলের সিনিয়র অসংখ্য নেতাকে মন্ত্রিপরিষদ ও ক্ষমতার ভর কেন্দ্রের বাইরে রেখে মন্ত্রিসভাকে 'কচিকাঁচার আসরে' রূপ দেয়ার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে না এটা ভাবাও অস্বাভাবিক বিষয়। একটা অভিজ্ঞতা সবাইকে বিবেচনায় নিতে হবে। পরিস্থিতি যখন আওয়ামী লীগের প্রতিকূলে চলে যায় তখন আওয়ামী লীগাররাই আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। পঁচাত্তর এর একমাত্র উদাহরণ নয়। এ ছাড়া দলীয় সরকার রাজনৈতিক ধূম্রজালে আটকা পড়লে দোষ চাপায় আমলাদের ওপর এবং সাবেক সরকার যদি প্রতিপক্ষ হয় তাদের ওপর। মনে হচ্ছে আমলা-প্রশাসনের ভেতর-বাইরের পরিস্থিতি ধারণার চেয়েও নাজুক, কল্পনার চেয়েও স্থবির। প্রশাসনের স্থবিরতা সরকারকে জিঘাংসার দিকে ঠেলে দিলো কি না এই আত্মজিজ্ঞাসা ও করণীয় নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের ওপরই বর্তায়।

দেশ যে ভালো চলছে না এ সত্যটি ক্ষমতাসীনরাও বোঝেন। চার দিকে হতাশা গ্রাস করেছে। তারই ফলাফল সরকারের নেতিবাচক কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। আইনশৃংখলার অবনতির মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ চুয়াত্তরের বীভৎস রূপেই যেন প্রত্যক্ষভাবে ছায়া ফেলেছে। আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবীরা একসময় লাল ঘোড়া দাবড়ানোকেই মোক্ষম ভাবতেন। এখন তারাই গণতন্ত্রের মেষশাবকের রূপ পাল্টে ব্যাঘ্রের হিংস্রতার সবক দিচ্ছেন। আল্লাহই ভালো জানেন এর শেষ কোথায়।

দুই. এফবিসিসিআই অর্থমন্ত্রীকে বললেন, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কট বর্তমানে দেশের অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ সঙ্কটে গার্মেন্টস শিল্পে বছরে ক্ষতির পরিমাণ ৪ হাজার কোটি টাকা। গ্যাসের জন্য অর্থনীতিতে সমূহ বিপর্যয়ের আলামত স্পষ্ট। শুধু গ্যাসের কারণে বছরে সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৬ হাজার কোটি টাকা। এ অবস্থায় প্রবৃদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না, গত বছরের চেয়ে রফতানি কমে গেছে দশমিক ৯৩ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে এসেছে। ১১ মাসে বিনিয়োগ কমেছে ৭১ শতাংশ। শ্রম ও পোশাক শিল্পের বাজার চলে যাচ্ছে অন্য রাষ্ট্রের হাতে। অস্থির হয়ে আছে বাজার। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছুঁয়েছে। অথচ বাণিজ্যমন্ত্রী মুখস্থ বলে দিলেন, গত দেড় বছরে বাজারে কোনো পণ্যের দাম বাড়েনি। চিনির দাম যা-ওরা একটু বেড়েছে সেই বৃদ্ধিরও কারণ নাকি আন্তর্জাতিক বাজারের সমস্যা। মন্ত্রী কি সত্য বললেন? তার এ জবাব দেয়ার জন্য বাজার চিত্রই যথেষ্ট। অবশ্য খাদ্যমন্ত্রী বাণিজ্যমন্ত্রীর বেফাঁস কথার তথ্যটি কবুল করেননি। খাদ্যমন্ত্রী বললেন, চালের দাম অনেকটা বেড়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তার যে চিত্র আমাদের সামনে রয়েছে, সেই চিত্রটিও সন্তোষজনক নয়। প্রয়োজনীয় মজুদ নেই। চাল সংগ্রহও ভালো অবস্থায় নেই। দু'বছর আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে সরকার আবার ভারত থেকে চাল আমদানির কথা বলছে। ২০০৭ সালে প্রণব বাবু ঢাকায় এসে চাল দেবেন বলেছিলেন পাঁচ লাখ টন। চুক্তিও হয়েছিল। শেষমেশ নানা কৈফিয়ত শেষে বাংলাদেশ চাল পেয়েছিল এক লাখ টন। এরই নাম বন্ধুত্ব! লোকসানের পাহাড় মৈত্রী এক্সপ্রেস তার পরও চালাতে হবে। জামদানি শাড়ি ও ইলিশ মাছ উপহার পাঠানোর মতো একতরফা প্রেমের নজির স্থাপন করেই যেতে হবে। আর কত 'প্রেম' দেখালে সরকার প্রীত হবে আল্লাহই ভালো জানেন।

আবার দ্রব্যমূল্য প্রসঙ্গে যেতে হয়। যারা বাজারে যান তারা বাণিজ্যমন্ত্রীর মুখস্থ বক্তব্যের সঠিক জবাব সময়-সুযোগ মতো নিশ্চয় দেবেন। মন্ত্রীর ভাষায়, দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য কিছু লোক নাকি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এরা বাজারেও ঢুকে পড়েছে। একসময় এই সামরিক আমলা মন্ত্রী এককালের খলিফাদের মতো বাজারে যেতেন। তবে ছদ্মবেশে নয়, প্রকাশ্যে বাজারে দাঁড়িয়ে বুকটান করে টিভি ক্যামেরায় কথার খই ফুটাতেন। সেই সুখী মুখ প্রায়ই প্রদর্শিত হতো। কথাও বলতেন বেশি। সেটা সরকারের মধুচন্দ্রিমার সময়কার কথা। এখন তিনি হয়তো আর বাজারে যান না। মনে হয় কিছুটা চুপসেও গেছেন। নিজে বাজার সদাই করে খানও না। যদি বাজারে যেতেন, ঢাকার বাজারের হালহকিকত তার অজানা থাকার কথা ছিল না। জানা থাকলে তিনি বলতে পারতেন না দেড় বছরে দ্রব্যমূল্য বাড়েনি।

বাজারমূল্য নিয়ে তিনি কথা বলেছেন ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে। দুর্ভাগ্য! তারাও প্রতিবাদ করেননি। তারা তাদের মতো করে লাভ-লোকসান মাথায় রেখে দাবিদাওয়া জানিয়েছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী কি জানেন দ্রব্যমূল্য নিয়ে বেফাঁস কথা বলে তিনি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং খেটে খাওয়া মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সাথে তামাশা করেছেন। এ তামাশা বড় ভয়ঙ্কর। এতে সত্যকে আড়াল করার চেষ্টার চেয়েও মানুষের দুঃখ-কষ্টকে অবজ্ঞা করার মনমানসিকতা বেশি সক্রিয় থাকে। এ সব নীতি-নির্ধারকদের কারণেই শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট উপেক্ষিত হয়ে যায়। খেটে খাওয়া মানুষের বেতন-ভাতার প্রশ্ন উঠলে আগে নাশকতার প্রশ্ন তোলা হয়। যদিও কারা এই নাশকতার হোতা সেটা কখনো পরিষ্কার করা হয় না। আমাদের পাট শিল্পের মতো পোশাক শিল্পকে ধ্বংস করার চক্রান্ত যে নেই তা কিন্তু ঠিক নয়, কিন্তু তারা বরাবরের মতোই অচিহ্নিত থেকে যাচ্ছে।

আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশের পাটে ভারতের পাট শিল্পের চাকা ঘুরছে। পাটের গুদামে আগুন লাগার সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি এখনো চোখের সামনে ভাসে। পাট শিল্পে নৈরাজ্য সৃষ্টির পুরো অবদান তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের। ১৯৭৪-'৭৫ সালের দিককার কথা। আমাদের পাট শিল্পের খুচরা যন্ত্রাংশসহ হুগলি নদীতে নৌকা ধরা পড়ল, কেউ তখন টুঁ শব্দ করেনি। আমাদের পাট শিল্প একটি একটি করে বন্ধ হয়, আর ওপারে নতুন নতুন পাট শিল্প গড়ে ওঠে। এর মাজেজাও কেউ জানতে চায়নি। আমাদের সোনালি আঁশ গলার ফাঁস হলো। প্রতিবেশীদের হলো গলায় বিদেশী মুদ্রার মালা, তখনো কারো আহাজারি শোনা যায়নি। আজ পাটের 'জিন-ভূত' নিয়ে কত আহ্লাদ। আদমজী চালুর মতো দিবাস্বপ্নও দেখানো হচ্ছে। আমাদের পুঁজিবাজার বা শেয়ার মার্কেটকে একবার ঠাণ্ডা মাথায় ধ্বংস করার দায় চিহ্নিত করেও এখন পর্যন্ত কারো টিকিটিও স্পর্শ করা হয়নি। এই স্পর্শ না করার আসল কারণ হয়তো শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির সময়ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। শেয়ারবাজার সম্পর্কে 'অবুঝ' মরহুম কিবরিয়া সাহেব ছিলেন অর্থমন্ত্রী। এখন আবার অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনীতিকরণও বিদেশী প্রভাবাধীন করার ষড়যন্ত্র ঘোলোকলায় পূর্ণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে ভাবে ভারতীয় টাটা। ধনিক শ্রেণীর পুঁজির সাথে বহুজাতিক কোম্পানির বোঝাপড়া ও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি স্পষ্ট। এখনো যেন রূপ পাল্টানো ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি এবং জগৎ শেঠদের দৌরাত্ম্যই বেশি। ড্যাপ বাস্তবায়ন থেকে ভূমিদস্যু নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র রাজনৈতিক বোঝাপড়ার বিষয়গুলোই প্রাধান্য পাচ্ছে। তাই দেশের স্বার্থ ও বাজার নিয়ে মন্ত্রীদের ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।